রবীন্দ্র-সংগীত : শুদ্ধসুরের বিকৃতি ও আইনগত প্রতিকার

শান্তা গুহ*

[সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনে প্রায় আড়াই হাজার গান রচনা করেছিলেন। অধিকাংশ গানেই তিনি সুর-সংযোজন করেছিলেন। যেগুলিতে তিনি নিজে সুর-সংযোজন করার অবকাশ পাননি, সেখানেই তাঁর নির্দেশিত পথে তাঁর যোগ্য শিষ্যরা পরবর্তীকালে সুরারোপ করেছেন যা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের পিছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল গানের 'স্বরলিপি'র। স্বরলিপিসহ গানগুলি প্রকাশের মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, রসজ্ঞ ও গীতজিজ্ঞাসুদের প্রয়োজন মিটিয়েছে অন্যদিকে উত্তরকালের জন্য রবীন্দ্র-সংগীতকে সংরক্ষিত ও সংবলিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই স্বরলিপি তথা সুরের বিকৃতি দেখে অনেক বিদগ্ধজন সন্দেহ পোষণ করেছেন ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-সংগীতের অস্তিত্ব বজায় থাকবে কিনা? একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সংগীত যখন অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে যেতে থাকে। পাশাপাশি একথাও স্বীকার করতে হয় যদি সঠিক পথে রবীন্দ্র-সংগীতকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে এগিয়ে নেওয়া যায় তবে তার সর্বজনীনতা আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথের গান যখন 'রবীন্দ্র-সংগীত' হয়ে ওঠেনি তখনই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সন্দিহান হয়েছিলেন তাঁর গান সম্পর্কে। কারণ, তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি লক্ষ করেছিলেন গানের সুরে বিকৃতি ঘটছে। এজন্য কবির আক্ষেপেরও অন্ত ছিল না। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর গানের কথা ও সুর এক নতুন প্রবাহ নিয়ে সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হবে অনন্তকাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিশ্বাস কালেরযাত্রায় কতটুকু রক্ষিত হয়েছে বা কতটুকু ব্যতয় ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই বিকৃতি স্থায়িত্ব লাভ না করে, বর্তমান নিবন্ধে সে বিষয়েই বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।]

রবীন্দ্র-সংগীত

সংগীত মানবমনের অতুলনীয় সৃষ্টি। প্রাণের স্বাভাবিক স্পন্দন থেকে এর জন্ম। নির্ঝরিণী যেমন পাষাণের বক্ষভেদ করে আপনা থেকেই জন্মলাভ করে, সংগীতও তেমনি প্রাণের আবরণ ভেদ করে স্বতঃউৎসারিত হয়। তাই বিশ্বপ্রাণ সংগীতের স্বাভাবিক মূর্ছনায় নিজ থেকেই সাড়া দেয়। সমগ্রপ্রাণের অনুভূতি, সমগ্রসত্তার বেদনা এর মধ্যে রয়েছে। সংগীত শুধু প্রাণকে স্পর্শ করে তা নয়, ভাষাকে করে তোলে মুখর, ভাবকে ফুটিয়ে তোলে সৌরভে, ছন্দের লাস্যলীলাকে করে তোলে মনোহর। সুর, তাল, লয়ে সংগীত যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন ভাষা, ভাব সুরকেই সহযোগিতা করে। সুর তখন মূর্তিমান হয়ে একাই সমগ্রবিশ্বকে ভরিয়ে দেয়। সংগীতের প্রধান অবলম্বন তাই সুর। সুরের মাধ্যমেই সংগীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

---

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

দুই ধরনের সংগীত প্রাচীন কাল থেকেই পরস্পরের সাথে সমৃদ্ধ হয়ে এবং নিজস্ব সত্তা ও ধারা নিয়ে সংগীতভুবনে অবস্থান করছে। একটি লোক সংগীত এবং অপরটি রাগ সংগীত। লোক সংগীত যেমন চিরায়ত সংগীত, রাগ সংগীত ও তেমন আবহমানকালের সংগীত। লোক সংগীত যেমন পল্লিমানুষের সহজ-সরল মনেরভাব প্রকাশ করে, রাগ সংগীতের সুরেও রয়েছে সেই ভাবেরই প্রকাশ। গ্রাম, প্রকৃতি আর পল্লিমানুষের মন – এই তিনটি উপাদান ফুটে ওঠে কবি, পালা, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, তরজা, ঝুমুর, বাউল, ভাওয়াইয়া, যাত্রা, চটকা, গম্ভীরা, পুথিঁপাঠ ইত্যাদি লোক গানে। আবার মানুষের মন বা মানসিক বৃত্তিগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে পরিশীলিত হয়ে রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করে বলে একে রাগ সংগীত বলে। যেমন : ধ্রুপদ, ধামার, দাদরা, সাদরা, খেয়াল, টপ্পা, ধুমরি, গজল ইত্যাদি রাগসংগীতের। সুতরাং লোক সংগীত এবং রাগ সংগীত দুটোরই আবেদন চিরন্তন।

রাগ সংগীতের উপর ভিত্তি করে রামনিধিগুপ্ত বা নিধুবাবু বাংলায় টপ্পা গানের উদ্ভব করেন। অষ্টাদশ শতকে এই টপ্পা গানের প্রচলন শুরু হয়। ভারতীয় টপ্পারীতির অন্তময় লাবণ্য স্পর্শ উনিশ-শতকের রুচিশীল সংগীত প্রেমীদের মধ্যে নবউদ্যামে সংগীত আন্দোলনের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের মতে : "কীর্তনে, বাঙ্গালির গানে, সঙ্গীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙ্গালির অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু, শ্রীধর কথকের টপ্পা গানে, হরঠাকুর, রামবসুর কবির গানে সঙ্গীতের সেই যুগল মিলনের ধারা" (করুণাময়, ১৩৯৯ : ২২৭)। এই নব আন্দোলনের ভাবধারায় রবীন্দ্রনাথের জন্ম। বাংলার নিজস্ব সংগীতধারার প্রভাব, হিন্দুস্থানি ক্ল্যাসিকাল ধারার প্রভাব এবং নতুন শিক্ষা-দীক্ষা এবং জীবনদর্শনের প্রভাব – এই তিন প্রভাবে রবীন্দ্রসৃষ্টিতে সংগীত এক নূতন ধারায় জন্ম নিল।

রবীন্দ্রনাথের গানের নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠেছিল লৌকিক, বিদেশি ও মার্গসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গমে। এই তিন প্রভাব মিলিয়ে তিনি তৈরি করলেন একটি সমন্বিত নূতনত্ব। বাংলা গানে নূতন ধারা নিয়ে এলো রবীন্দ্র-সংগীত। হিসাব মতে, রবীন্দ্র-সংগীতের মোট সংখ্যা দুই হাজার দুই শত বত্রিশ। তার মধ্যে স্বরলিপিবদ্ধ গান ১৮৯৬টি। একে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : মৌলিক আর ভাঙা গান। এই ভাঙা গান বলতে বুঝায় ছোটোবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ যেসব গান নিজে বা অন্য কারোর কাছে শুনে পছন্দ করে সেগুলির সুরকাঠামো অনেকাংশে অক্ষত রেখে তাতে বাণী বসিয়েছেন। তাঁর গানের বিপুলবৈচিত্র্য আর প্রবাহ মনের মধ্যে গড়ে তোলে এক অভিনব সুরের জগৎ। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> একসময় অবশ্য ছিল, যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সুরের ছকে গান বানাতেন। যখন থেকে দেশি সঙ্গীত, অর্থাৎ বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের স্রোত তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করলে তখনই তিনি নিজের সন্ধান পেলেন, স্বাধীন হলেন। এতদিন হচ্ছিল অনুকরণ, হাতেঘড়ি, এখন শুরু হল সৃষ্টি। এই বোধহয় জীবনের রীতি। দেশের সন্ধান, দরবার ও নগরের বাইরের মাটির ও গ্রামের সন্ধান, শুদ্র ও যবনের সন্ধান যখন পাওয়া যায়, তখনই মানুষ, জাতি, সভ্যতা নবজীবন লাভ করে। মাটির সন্ধান পেয়েছেন বলে রবিবাবু সঙ্গীতকে নবজীবন দিতে পেরেছেন। (ধূর্জটিপ্রসাদ, ১৩৭০ : ১৪০)

'বাণী ও সুর : রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রভাতী সংবেদন' শিরোনামে রচিত প্রবন্ধে অপূর্বকুমার রায় লিখেছেন :

> ভাবরসে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী স্বদেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত শাস্ত্রীয় মাত্রায় সঙ্গীতের (স্বল্প ক্ষেত্রে বিদেশী সংগীতের) সহায়তায় শ্রোতার দরবারে সৃষ্টি করে এক অসামান্য সংবেদন, যে সংবেদন এনে দেয় কখনো প্রভাতী, কখনো সায়ন্তনী, কখনো আবার নিশিথিনীর অনুভূতি। শুধু তাই নয়, প্রভৃতির বিভিন্ন ঋতু, মানুষের আনন্দ-বেদনা এবং মিলন-বিরহ কথা ও সুরের সম্মিলিত আবেদনে মূর্ত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রসংগীতে। (রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৪০৩ : ২০)

দার্শনিক প্লেটো বলেছেন : "আত্মার জন্য সংগীত"। ওয়াল্টার পিটার বলেছেন : "জীবনে পূর্ণ-প্রাজ্ঞ শিক্ষা পেতে হলে সংগীত একান্তই প্রয়োজনীয়।" ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : "সঙ্গীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের বিকাশ তার মধ্যে আছে।" সংগীত সম্পর্কে এক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> আমার মনে যে সুর জমেছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না। সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোনটা বড়ো, কোনটা ছোটো বোঝা গেল না। আমার গান তাঁর ইচ্ছামত ভঙ্গি দিয়ে গেয়ে থাকেন, তাতে স্বরূপ নষ্ট হয় সন্দেহ নেই। গায়কের কণ্ঠের ওপর রচয়িতার জোর খাটে না। সুতরাং ধৈর্য্য ধরে থাকা ছাড়া অন্য পথ নেই। আজকালকার অনেক রেডিও গায়কও অহংকার করে বলে থাকেন – তারা আমার গানের উন্নতি করে থাকেন। মনে মনে বলি পরের গানের উন্নতি সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তারা ধন্য হতে পারেন। সংসারে যদি উপদ্রব করতেই হয় তবে হিটলার প্রভৃতির ন্যায় নিজের নামের জোরে করাই ভালো। তোমাদের কাছে আমার মিনতি – তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারিনা। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব কিছু সইতে হয়, এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম। [...] বুলাবাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ – এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো – এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি করো। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ২৪)

বৈচিত্র্য-বৈভবে রবীন্দ্র-সংগীত

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গান বহুমুখী। তাঁর সৃষ্টি প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মহিমা অতুলনীয়। রবীন্দ্র প্রতিভার যা কিছু সুন্দর, মহৎ, বরণীয় ও স্মরণীয় এর সমস্তই তাঁর গানে এমনভাবে একাত্ম হয়ে আছে যে কবি রবীন্দ্রনাথকে জানার ও বুঝার জন্য আর কিছু খুঁজতে হয় না – তাঁর গানগুলিই যথেষ্ট। বিষয়বস্তুর বিচারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকে পূজা, স্বদেশ, প্রকৃতি, প্রেম, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক – এই ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। এই ছয়টি পর্যায়ের মধ্যে প্রকৃতি এবং প্রেম পর্যায়ের গানই অধিক। তারপরেই স্থান হল ভগবৎপ্রেরণা ও উপাসনামূলক পূজা

পর্যায়ের গান। ব্যক্তিমানসের প্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও তৎজনিত বিষাদ-হতাশা-আনন্দ-দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভব্য অনুভূতি কবির অনন্য সংবেদনশীল রচনায় ধরা পড়েছে; গানের সুরের মালাতে জীবনের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নাকে তিনি গেঁথেছেন আপন মনের মাধুরীতে। মানবজীবনের সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রিক ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি সুরের মানসিকতাকে তিনি তাঁর গানের মাঝে রূপ দিয়েছেন সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর মতো। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি আমাদের বাংলা গানে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে গেছেন।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ আছে। যথা : শৃঙ্গার, করুণ, বীর, হাস্য, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস, ভয়ানক ও শান্ত রস। রবীন্দ্রনাথের গানে এইসব রসেরই সন্ধান মেলে। নিম্নে বিভিন্ন রসাশ্রিত রবীন্দ্রসংগীতের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো :

শৃঙ্গাররস : আদিরসের আরেক নাম শৃঙ্গাররস। প্রেম-স্নেহ ও বাৎসল্য এই পর্যায়ের রস হিসাবে গণ্য হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের সব গানকে আমরা এই রসের বলতে পারি। 'আমার পরান যাহা চায়', 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' ইত্যাদি।

করুণরস : যে রস আমাদের মধ্যে দুঃখ, শোক ও হতাশার জন্ম দেয় তা-ই হলো করুণ রস।

> 'কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়' (বাল্মীকি প্রতিভা), 'বুক যে ফেটে যায়' (শ্যামা)। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০১ : ২৩, ১১৩)

বীররস : যে রসে শৌর্য, বীর্য ও উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটে তা-ই হলো বীররস। স্বদেশ পর্যায়ের কিছু গান এই রসের পর্যায়ভুক্ত।

> 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'
> 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৮ : ২৬৫, ২৫৫)

হাস্যরস : হাস্যরস বস্তুত অদ্ভুতরস থেকে জাত। যা কিছু হাসির উদ্রেক করে তা এই রসাশ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-ই বাংলাগানে নির্মল সংযত হাস্যরসের প্রথম দিশারি।

> 'কাটাবন বিহারিণী'
> 'ও ভাই কানাই কারে জানাই'
> 'আঃ বেঁচেছি এখন' (বাল্মীকি প্রতিভা)
> 'চল নিয়মিত' (তাসের দেশ) (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৮ : ৫৯৬, ৫৯৬, ৬৩৫, ৮০৯)

রৌদ্ররস : যা থেকে ক্রোধের উৎপত্তি তা হলো রৌদ্ররস। বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবি লিখেছিলেন : 'সর্বখর্ব তারে দহে' কিংবা চিত্রাঙ্গদার 'অহো কি দুঃসহ স্পর্ধা' গানগুলি এই রসাশ্রিত।

অদ্ভুতরস : অদ্ভুতরস বিস্ময় উদ্রেক করে। *তাসের দেশের* অনেক গান এই পর্যায়ের। এছাড়া চিত্রাঙ্গদার 'কাহারে হেরিলাম' এবং 'বাল্মীকি প্রতিভার' 'কি বলিমু আমি' এই রসাশ্রিত।

ভয়ানক রস : এর দ্বারা ভয়ের উদ্রেক হয়। যেমন : 'এ কী ঘোর বনে' (বাল্মীকি প্রতিভা)।

শান্ত রস : যে গান সুখে আনন্দ এবং দুঃখে শান্তি আনয়ন করে সেগুলি এই পর্যায়ের। যেমন : 'শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল'।

বীভৎস রস : এতে ঘৃণার প্রকাশ হয়। যেমন : শ্যামার 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা' কিংবা চণ্ডালিকার 'জাগেনি এখনো জাগেনি।

জাগতিক নিয়মে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। কত নব নব সাজে এই ঋতুসমূহ আমাদের দুয়ারে এসে ফিরে ফিরে যায়। খবর আমরা কজনেই বা রাখি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন 'ঋতু উৎসব' – গানে গানে মুখর হয়ে উঠল তা। কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই অনুষ্ঠানগুলোকে আমরা প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা : ক. বনমহোৎসব যার রাবীন্দ্রিক নাম বৃক্ষরোপণ উৎসব; খ. সামাজিক অনুষ্ঠান : জন্ম মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি; গ. পারিবারিক অনুষ্ঠান : যে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান কেবল পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের গানে এই তিনপ্রকার অনুষ্ঠানগুলি এক রুচিময় উৎকর্ষ লাভ করেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উল্লেখসহ নিচে আনুষ্ঠানিক গানের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

আহ্বান সংগীত	: 'সবারে করি আহ্বান'
জাতীয় সংগীত	: 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'
রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন	: 'হে নূতন'
মহাত্মার জন্মদিন	: 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'
মহাত্মার মৃত্যুদিন	: 'জীবন যখন শুকায়ে যায়'
যিশুর জন্মদিন	: 'একদিন যারা মেরেছিল গিয়ে'
বিবাহ বাসর	: 'সুধাসাগর তীরে' 'নবজীবনের যাত্রাপথে' 'দুইটি হৃদয়ে একটি আসন'
জন্মদিনের গান	: 'ভয় হতে তব অভয়মাঝে' 'হে চিরনূতন'
মৃত্যুদিনের গান	: 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' 'তোমার অসীমে
শ্রাদ্ধবাসর	: 'চির সখা হে ছেড়োনা' 'শেষ নাহি যে' 'কেন রে এই দুয়ারটুকু' 'আরও আঘাত সইবে আমার'
বধূবরণ	: 'ওগো বধূ সুন্দরী', 'সুমঙ্গলী বধূ'
নববর্ষের গান	: 'এসো হে বৈশাখ' 'আমারে দিই তোমার হাতে'
বর্ষশেষের গান	: 'দিন যদি হল অবসান' 'বর্ষ এই গেল চলে'
ফসলকাটার গান	: 'আয়রে মোরা ফসল কাটি'
হলকর্ষণের গান	: 'আমরা চাষ করি আনন্দে' 'মাটি তোদের ডাক দিয়েছে'
বৃক্ষরোপণের গান	: 'আয় আমাদের অঙ্গনে'

'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও'

গৃহ প্রবেশের গান : 'এসো হে গৃহদেবতা'
'ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি'

নলকূপ খননের গান : 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল'

চা-চক্রের গান : 'হায় হায় হায় দিন চলে যায়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৮ : ৬১০, ২৫৯, ৮৬৮, ১৬৬, ৬০৭, ৮৬৪, ৬০৭, ৫৭, ১১৭, ১০৮, ২৩৪, ১৬৯, ২৩৮, ২৩৯, ২৯৮, ৫০৫, ৪৩২, ২০৭, ২৩৬, ৮৩১, ৬১৩, ৬০১, ৭৯৪, ৬১৯, ৬১১, ৬১২, ৩৪৫, ৪৩১, ৫৯৮)

নানা রাগের মিশ্রণ রবীন্দ্র-সংগীত

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভা সুরসৃষ্টিতেও বিস্ময়কর সাফল্যের নজির রেখেছে। এই সুর-বিপ্লব সংঘটনে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীত, লোকসংগীত, পাশ্চাত্য এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সংগীত থেকেও সুর আহরণে দ্বিধা করেননি। বিভিন্ন রাগের মিশ্রণে তিনি নূতন নূতন সুরের ঝরনা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এই নবসৃষ্ট সুরগুলি সম্বন্ধে বলেছেন, বড়ো আদর্শ হতে বিচ্যুত হবে না। তাদের জাত যাবে, কিন্তু জাতি যাবে না। তারা সচল হবে, তাদের সাহস বাড়বে, নানারকম সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানা প্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য ফুটে উঠবে। তাঁর প্রতিটি গানে ঘটেছে এই সৌন্দর্যের অনিঃশেষ প্রকাশ এবং এর থেকেই বুঝা যায় যে, রাগ মিশ্রণের ক্ষেত্রেও তিনি সার্থক হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাগ মিশ্রণ করতে গিয়ে তিনি স্বেচ্ছাচারী হননি। সুরসৃষ্টির পথে তা বিঘ্ন হয়ে দেখা দেয়নি বরং গানের ভাববৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন : সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নয়, ভাবপ্রকাশের স্থান, যতখানিতে ভাব প্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত। সুরমিশ্রণ বিষয়ে 'সংগীতের উদ্দেশ্যে' নামক প্রবন্ধে তাঁর উক্তি : "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শোনায় আর তাহাতে বর্ণনীয়ভাবের সহায়তা করে, জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখব না কেন?" (কাজল, ১৩৮৯ : ৮৫)

রবীন্দ্রনাথ যে সকল রাগের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন সেগুলি অনুধাবন করলেই বুঝা যাবে সমপ্রকৃতির রাগের মধ্যেই তিনি এই কাজ করেছেন। যেমন : কাফি-কানাড়া, আনন্দ-ভৈরব, আশা-ভৈরবী, সোহিনী-কালেংড়া, কাফি-সিন্ধু, ইমন-ভূপালি, ঝিঝিট-খাম্বাজ, টোড়ী-ভৈরবী, দেশ-খাম্বাজ, দেশ-সিন্ধু, দীপক-পঞ্চম, নট-হাম্বীর, পিলু-বাঁরোয়া, বাগেশ্রী-বাহার, বেহাগ-খাম্বাজ, মারু-কেদার, ললিত-কালেংড়া, সিন্ধু-খাম্বাজ, সিন্ধু-বাঁরোয়া, সিন্ধুড়া-খাম্বাজ ইত্যাদি।

নিম্নে মিশ্রিত রাগের কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হল :

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর – ভায়রো-ভৈরবী
অসীম আকাশে অগণ্য – মারু-কেদারা
চক্ষে আমার তৃষ্ণা – সারং-মল্লার-কানাড়া
প্রখর তপনতাপে – তোড়ী-মুলতানি-ভীমপলশ্রী
পথে যেতে ডেকেছিল – পিলু-বাঁরোয়া
আজি দক্ষিণপবনে – পঞ্চম সোহিনী

আমার সকল দুখে প্রদীপ – ভীমপলশ্রী-মুলতানি
ডেকো না আমারে, ডেকোনা – ইমন-পূবী
আবার চাই শুনাবারে – বেহাগ খাম্বাজ
অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে – জৌনপুরী খাম্বাজ
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো – মল্লার দেশ তিলককামোদ

উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে দেখা যায় যে, কোথাও কোথাও সমপ্রকৃতির রাগের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্রষ্টার অসাধারণ প্রতিভায় রীতিবিরুদ্ধ এই মিশ্রণই হয়ে উঠেছে এক অনাস্বাদিত রসভাণ্ডার এবং এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা; এখানে তিনি একক প্রতিদ্বন্দ্বীহীন চিরকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার।

রবীন্দ্রসংগীতে তান ও আলাপ

শাস্ত্রীয় সংগীতে খেয়াল অঙ্গের গানে আলাপ ও তান অপরিহার্য। কারণ, এখানে রাগ-রূপকে নানা অলংকরণের দ্বারা পরিবেশন করা হয়। এখানে বাণী গৌণ এবং দুর্বল, তাই বিশেষ রাগটির সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ করবার দিকেই থাকে লক্ষ এবং এর জন্যই প্রয়োজন হয় আলাপ, তান, বোলতান, সরগম্ ইত্যাদির। কিন্তু তুলনামূলকভাবে রবীন্দ্রসংগীতের লক্ষ্য শাস্ত্রীয় সংগীত অপেক্ষা পৃথক। রবীন্দ্রনাথ খেয়াল অঙ্গের গান রচনা করলেও কখনও বাণী কিংবা ভাবকে দুর্বল করে রাগের প্রাধান্য দেননি। তাঁর অন্যান্য গানের মতো এখানেও সুর ও বাণী ভাবের অনুসারী। রবীন্দ্রসংগীতে আলাপ কিংবা তানের প্রয়োগ রসসৃষ্টিতে সাহায্য না করে রসহানি ঘটাবে বলেই মনে হয় এবং হয়তো এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর গানে 'তান' প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া কবি নিজেই বলেছেন হিন্দুস্থানি সংগীতের ধারার বিকাশ যেভাবে হয়েছে, আমাদের বাংলা সংগীতের ধারা সেভাবে বিকাশ লাভ করেনি। এই বক্তব্যকে তিনি আরও পরিস্ফুট করেছেন নিম্নলিখিত উক্তির সাহায্যে :

> [...] হিন্দুস্থানী সংগীত সুরমুক্ত পুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরিক বলে মানতে সে নারাজ– বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতি। বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী পরস্পর আপোষ করে নেয়, যেহেতু সেখানে একের যোগেই অন্যটি সার্থক। [...] হিন্দুস্থানী গানে যদি কাব্যকে নির্বাসন দিয়ে কেবল অর্থহীন তা-না-না করে সুরটাকে চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা সে গানের পক্ষে মর্মান্তিক হয় না। সে রস সৃষ্টিতে সংগীতেরই একাধিপত্য, যেখানে তান কর্তব্যের রাস্তা যতটা অবাধ, অন্যত্র অর্থাৎ যেখানে কাব্য সংগীতের একাসনে রাজত্ব সেখানে তেমন হতেই পারে না। হিন্দুস্থানী সংগীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটাই যে চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটা গেয়ে গেলে নেড়া নেড়া না শুনিয়েই পারে না।[...] কারণ, দরবারী কানাড়া খেয়াল সাদামাটা গেয়ে গেলে নেড়া নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ, দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামাটাভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখিনি যে, সেটা অপরের ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব। (সম্ভুনাথ, ১৯৭১ : ১৩৫)

তাই আমাদেরও মতে, উক্ত কারণে রবীন্দ্রসংগীতে তান আলাপ অপ্রয়োজনীয় রসহানিকর এবং কাব্য সংগীতের আদর্শ বিরোধী। সর্বোপরি রবীন্দ্র-সংগীতে বাণী কেবল স্বরেরবাহক নয়, এর একটি পৃথক সত্তা আছে যা সুরের সঙ্গে মিশে এক অনির্বচনীয়তার সন্ধান দেয়। তাই হিন্দু গানের বাণীকে খুশিমত ভেঙে-চুরে যেমন ওস্তাদি করবার অবকাশ থাকে, রবীন্দ্র-সংগীতে সে অবকাশ নেই। সেখানে গানের বাণীই অর্থবহ। হিন্দুস্থানি গানের সুরে রস শ্রোতার কাম্য কিন্তু বাংলাগানে শ্রোতা চায় সুরের সঙ্গে বাণীর মিলনজনিত রসাস্বাদ। অর্থাৎ রবীন্দ্র-সংগীত নিছক সংগীত নয়, একাধারে সংগীত ও কাব্য। রবীন্দ্রনাথ গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করিয়েছেন। তাই তানের দ্বারা রবীন্দ্র-সংগীতকে অলংকৃত করতে গেলে তা গানের কাব্যরসকেই ব্যাহত করবে। সর্বোপরি, যেখানে সুরস্রষ্টার নিজের অনুমোদন নেই, সেখানে তান প্রয়োগ করার অর্থই হলো খোদার ওপর খোদকারী করা। ঠিক এই কারণে, রবীন্দ্র-সংগীতে বিস্তার করা অপ্রয়োজনীয়, রস ও ভাব হানিকর। এককথায় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে এমন ফাঁক রেখে যাননি যা তান, আলাপ কিংবা বিস্তার করে ভরে দেবার সুযোগ আছে। তাঁর প্রত্যেকটি গানই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সুরবিকৃতির নমুনা

স. ম. শামসুল আলম 'সঙ্গীতে বিকৃত সুর' শিরোনামে লিখেছেন :

> খুবই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছি, কিছু তরুণ শিল্পী (অথবা শিল্পী নামের কেউ) ব্যান্ডদল গঠন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বিকৃত করে, আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করে বিকৃতভাবে সঙ্গীত উপস্থাপন করছে। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সাদী মহাম্মদ, শ্রীকান্ত আচার্য বা তপন মাহমুদের মতো প্রতিভাবান শিল্পীরা এ ব্যাপারে খুব সোচ্চার হলেও তাঁদের কথায় কেউ কর্ণপাত করছেন না। ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমগুলোর বেশ কিছু চ্যানেল এই বিকৃত সুর, বিকৃত বাজনা ও বিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে সঙ্গীত উপস্থাপন করছে যা বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ। (দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ১০ মে ২০১৬ : ০৮)

জুয়েল মাজহার 'গান তার ডুবে যায় কোন কোলাহলে' শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে লিখেছেন :

> নিরীক্ষার নামে রবীন্দ্রনাথের গায়ে বহিরঙ্গের চটক-চমক দেয়া যাবে বটে, কিন্তু তাতে গানের অর্ন্তনিহিত ভাব স্ফূর্তি পাবে না, ভাবের বিচ্যুতিই শুধু ঘটবে। 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' গানের বাণীর সাথে নচিকেতা যখন জুড়ে দিয়েছেন 'উলালা উলালা [...]' এবার তাহলে বুঝুন নচিকেতার কেতা! (বাংলা নিউজ ২৪. কম অনলাইন পত্রিকা, ৮ জানুয়ারি ২০১৩ : ০৪)

"কলাভবনে বিকৃত সুরে 'সেদিন দুজনে' বিতর্ক" শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিজস্ব সংবাদদাতার বরাত দিয়ে লিখেছে :

> বিশ্বভারতীর কলাভবনে চলছে নন্দন মেলা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োয় সেই কলাভবনে রবিবার সন্ধ্যায় দফায় দফায় বিকৃত সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দেখা গিয়েছে একদল তরুণ-তরুণীকে। বিশ্বভারতীর আঙ্গিনায় রবীন্দ্রনাথের গানকেই বিকৃত করে গাওয়া আসলে কবিকেই অসম্মান করা এবং অপসংস্কৃতির চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মনে করেন বিশ্বভারতীর অধিকাংশ কর্মী, অধ্যাপক, আশ্রমিক ছাত্র-ছাত্রী, এবং প্রাক্তনীরা। প্রবীণ আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "এসব রুচিহীনতার পরিচয়। আশ্রম শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের গান কোথাও এমনভাবে বিকৃত করে গাওয়া কাম্য নয়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ : ৫)

আগের দিন অর্থাৎ ২ ডিসেম্বর ২০১৯ 'Daily Hunt' পত্রিকা নিজস্ব প্রতিনিধির বরাত দিয়ে শিরোনাম করেছে, 'চাঁদ উঠেছিল গগনে' রবীন্দ্র-সংগীতটি বিকৃত করে গাইলেন বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা!' (পৃষ্ঠা. ২)

একটি অনলাইন পত্রিকা সুরবিকৃতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যার শিরোনাম হলো "জাতীয় সঙ্গীতে বিকৃতি! 'ক্ষ' এর স্পর্ধা প্রতিহত এখনই।" (বাংলা নিউজ ২৪.কম, ২০১৩) এই 'ক্ষ' হচ্ছে লন্ডনভিত্তিক একটি ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ব্যান্ড। অন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করে :

> কয়েকদিন ধরে 'লন্ডনভিত্তিক একটি ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ব্যান্ড 'ক্ষ'-এর গাওয়া বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুরবিকৃতি নিয়ে আলোচনা চলছে পত্রিকা, ফেসবুক আর ব্লগ জুড়ে। গানটি ডাউনলোড করে শুনলাম ৪ বার। ভালোই গেয়েছে, ফিউশন দিয়েছে। তবে এই আধুনিকায়ন করতে গিয়ে সুরে একটু বিকৃতি ঘটেছে বটেই। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল গানটি শুরু হয়েছে 'কি শোভা কি ছায়া গো [...]' থেকে। (আলো চাই, সাময়িকী ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ : ২০)

একটি ভারতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় :

> রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রোদ্দুর রায়ের বিকৃত গান গাওয়ার কারণে তীব্র বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তবে আগে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও বেজেছিল তার এই বিতর্কিত গান (রোদ্দুর রায় নামের একজন ইউটিউবার 'চাঁদ উঠেছিল গগণে' গানটি বিকৃত করে গেয়ে তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করে)। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী আবার নিজেদের পিঠেই রঙ দিয়ে লিখেছেন, রোদ্দুর রায়ের সেই 'বিকৃত' গানের লাইন। বিস্তর বিতর্ক হল। জল এতদূর গড়াল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগও করলেন। (এই সময়, ১৭ মার্চ ২০২০ : ৪)

ঐ সময়ে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তপন মাহমুদের কাছে প্রশ্ন ছিল : "রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে ফিউশন হচ্ছে। ব্যাপারটিকে কীভাবে দেখেন?" তাঁর উত্তরে তপন মাহমুদ বলেন :

> ইদানিং অযোগ্যদের হাতে ফিউশনের নামে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকৃতি ঘটছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে কিছু করতে চাইলে আগে শিখতে হবে, বুঝতে হবে। সেই কাজটা করার মতো যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। তখনই নতুন রূপে, নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থাপন সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত নিয়ে কিছু কথা বলে গেছেন। সেগুলো মাথায় রাখতে হবে। (ভোরের কাগজ পত্রিকা, ৪ আগস্ট ২০১৯ : ৭)

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সংযম সাধনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, সৌন্দর্য, প্রেমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংগ্রামের অসামান্য গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন :

> ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
> নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
> সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল নৈবেদ্য। (নৈবেদ্য, ১৯০১ : ২২৭)

রবীন্দ্রনাথের মতে :

> সৌন্দর্যকে পুরোমাত্রায় ভোগ করতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন। নতুবা প্রবৃত্তি অসংযত থাকিলে শিশু ভাতের থালা লইয়া যেমন অন্ন ব্যঞ্জন কেবল গায়ে মাখিয়া মাটিতে ছড়াইয়া

> বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোলে, অথবা অল্পই তাহার পেটে যায়, ভোগের সামগ্রী লইয়া আমাদের সেই দশাই হয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩১৪ : ৩০)

বিশিষ্টজনের অভিমত

একটি ভারতীয় দৈনিক "রবীন্দ্রসঙ্গীত, 'হুলালা' এবং 'হ্যা হ্যা'" শিরোনামে একটি প্রশ্নোত্তর প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল :

> রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার ফাঁকে কি পরীক্ষার নামে 'হু-লা লা' ঢুকিয়ে দেওয়া যায়? বা কখনো 'হ্যা হ্যা' আওয়াজ? পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে করা যায়, করলে কতটাই বা? রবীন্দ্রসঙ্গীত বিকৃতি নিয়ে সাম্প্রতিক বির্তকের প্রেক্ষাপটে মতামত দিলেন বাংলার বিভিন্ন প্রজন্মের নামী সঙ্গীত শিল্পীরা। অজয় চক্রবর্তী বলেন : "এ নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। যিনি সেই পরীক্ষা করছেন, তাঁর সংস্কৃতির উপর সব নির্ভর করছে" (এই সময়, ১২ মার্চ ২০২০ : ৬)। কবীর সুমন-এর অভিমত : "রবীন্দ্রনাথ যে সুর করেছেন তা লিপিবদ্ধ আছে। আছে যখন, সেটা পালটে আমি একটা খেল দেখাব কেন? তা হলে তো নিজে গান তৈরি করলেই হয়" (এই সময়, ১২ মার্চ ২০২০ : ৬)। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা'র মতে : "হঠাৎ রবীন্দ্রগানের মাঝে অন্য কোনো গীতিকারের কথা এলে ভালো লাগে না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বার বার বলেছেন তাঁর গান যেন তাঁর থাকে। এক্ষেত্রে সে নিয়ম ভাঙ্গা হয় অযথা। আমার এবিষয়ে একদম মত নেই" (এই সময়, ১২ মার্চ ২০২০ : ৬)। ইন্দ্রানী সেন-এর অভিমত : "রবীন্দ্রনাথের কথা বা সুর বদল করলে এখন মনে হয় এটা একধরনের বিকৃতি। যদি কথা বা সুর বদল করতেই হয়, তা হলে রবীন্দ্রনাথ কেন? নিজের কিছু সৃষ্টি করুন। সেটা নিয়ে যা ইচ্ছে কাঁটা ছেঁড়া করুন" (এই সময়, ১২ মার্চ ২০২০ : ৬)। লোপামুদ্রা মিত্র'র মতে : "ওটা এক্সপেরিমেন্ট নয় অসভ্যতা। সহজে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য একটা ভুল পথ। কেউ বিকৃত মনস্ক হলে এমনটা করতেই পারেন। সেটাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট বলাটা ঠিক হবে না।" (এই সময়, ১২ মার্চ ২০২০ : ৬)।

রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার উপর একটা সময় কড়া বিধিনিষেধ ছিল। দেবব্রত বিশ্বাসের মতো রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীকে ১৯৬৯ সালের ২৫ জুলাই চিঠি দিয়েছিল বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ড। চিঠিতে বলা হয়েছে : তাঁর গাওয়া দুটি গান বাতিল করেছে বোর্ড। বাতিল হওয়ার কারণ, প্রয়োজনাতিরিক্ত যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার। যার ফলে গানের সংবেদন আর আবেগ ক্ষুণ্ন হয়েছে। এখন সেই বিধিনিষেধ নেই। গানের দল 'শিরোনামহীন' বের করেছে রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের গানকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগের ব্যাপারে তাঁদের ভাষ্য হলো :

> রবীন্দ্রনাথের সুর ও বাণীকে ঠিক রেখে গেয়েছি। যন্ত্রানুষঙ্গে হয়তো পরিবর্তন এসেছে। সময় বদলেছে, সাবেকি যন্ত্রানুসঙ্গের বদলে ব্যবহার করেছি আধুনিক ড্রাম, পারকালনস। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের সুর ও বাণী বদলাইনি। (এই সময়, ১২ মার্চ, ২০২০ : ৭)

দিলীপ রায়ের সাথে আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথ সখেদে জানিয়েছিলেন :

> আমার গানের বিকার আমি প্রতিদিন এত শুনছি যে, আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি বলেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করে না। (দিলীপ, ১৩৭৬ : ৩২)

বিকৃতি প্রতিরোধে আইনি কাঠামো

শিল্পসংস্কৃতির পাদপীঠ ইউরোপে কপিরাইট ধারণার উদ্ভব হয়। লেখক বা শিল্প স্রষ্টার সৃষ্টি তাঁর বিনানুমতিতে কপি করা হলে লেখকের সৃষ্টির মর্যাদা থাকে না। এই মর্যাদা ও সৃষ্টির সুরক্ষার প্রাচীন ধারণা থেকেই কপিরাইট বা মেধাসত্ত্ব আইনের সৃষ্টি। বাংলাদেশের জন্মের আগে থেকেই ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কপিরাইট আইন বলবৎ ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের 'কপিরাইট' আইন ২০০০' বলবৎ রয়েছে।

কপিরাইট আইন ২০০০ (২০০০ সালের ২৮ নং আইন) অধ্যায়-৩ ধারা ১৪ অনুযায়ী কপিরাইটের অর্থ "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'কপিরাইট' অর্থ, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোনো কর্ম বা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কোন কিছু করা বা করার ক্ষমতা অর্পণ।" যথা :

(১) কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যতীত, সাহিত্য, নাটক বা সংগীত কর্মের ক্ষেত্রে–

ক) যে কোনো উপায়ে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কর্মটি সংরক্ষণ করাসহ যে কোনো বস্তুগত আঙ্গিকে কর্মটির পুনরুৎপাদন করা।

খ) সার্কুলেশন রহিয়াছে এমন অনুলিপি ব্যতিরেকে কর্মটির অনুলিপি জনগণের জন্য ইস্যু করা।

গ) জনসমক্ষে কর্মটি সম্পাদন করা অথবা উহা জনগণের মধ্যে প্রচার করা।

ঘ) কর্মটির কোনো অনুবাদ উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, সম্পাদন বা প্রকাশ করা।

ঙ) কর্মটির বিষয়ে কোন চলচ্চিত্র, ছবি বা শব্দ রেকর্ড করা।

চ) কর্মটির সম্প্রচার করা বা কর্মটির সসম্প্রচারকৃত বিষয় মাইক বা অনুরূপ অন্য কোনো যন্ত্রের সাহায্যে জনসাধারণকে অবহিত করা।

ছ) কর্মটি অভিযোজন করা।

জ) কর্মটির অনুবাদ বা অভিযোজন বিষয়ে উপরের (ক) হইতে (চ) উল্লিখিত কোনো কাজ করা।

২. Definition (সংজ্ঞা) - In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(৩৭) 'Musical work' means a work Consisting of Music and includes any graphical notation of such work but does not include any words or any action intended to be sung, spoken or performed with the music.

৭৩ (১) কোনো ব্যক্তি শব্দ রেকর্ডিং এবং উহার পাত্রের উপর নিম্নোক্ত বিবরণী প্রদর্শন ব্যতীত কোনো কর্মের বিষয়ে কোনো শব্দ রেকর্ডিং প্রকাশ করিবে না। যথা :

ক) শব্দ রেকর্ডিং প্রস্তুতকারীর নাম ও ঠিকানা

খ) উক্ত কর্মের কপিরাইটের মালিকের নাম ও ঠিকানা এবং

গ) উহার প্রথম প্রকাশনার বছর।

প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনের অনেক ফাঁক-ফোকর আছে। তা সত্ত্বেও যেটুকু আছে তাঁর যথার্থ প্রতিফলন ঘটে না। পুলিশ চাইলে কোনো ধরনের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই পাইরেসি সংক্রান্ত সৃষ্টিকর্মের সব অনুলিপি বা যন্ত্রপাতি বা দ্রব্যসামগ্রী এবং অনুলিপি তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সব প্লেট বা যন্ত্রপাতি বা দ্রব্যসামগ্রী যেখানেই পাওয়া যাবে, তা জব্দ করতে পারেন এবং সৃষ্টিকর্মের বিকৃতিকারীকে গ্রেফতার করতে পারেন। কিন্তু দেখা যায়, পুলিশ নিজেই কপিরাইট আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না। ওয়াকিবহাল হলেও অনেক সময় পুলিশের এ ব্যাপারে অনীহা দেখা যায়। তাই বিদ্যমান আইনের সংশোধন প্রয়োজন মনে করে সরকার ২০১৭ সালে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে যাতে সৃজনকর্মের যথাযথ সুরক্ষা ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা যায়। যা এখনো আইনে পরিণত হয়নি। ২৩ এপ্রিল ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে 'কপিরাইট নতুন আইন' শিরোনামে 'যুগান্তর' পত্রিকার খান মাহবুব একটি কলামে উল্লেখ করেছেন, ২০০০ সালে প্রণীত আইন (২০০৫ সালে সংশোধিত) আজ অনেক ক্ষেত্রেই তামাদি হয়ে গেছে। কারণ, বিদ্যমান আইন দ্বারা সংগীত নাটক, চলচ্চিত্র, গ্রন্থ ইত্যাদি সেক্টরে পাইরেসি রোধ করা যাচ্ছে না। ইতোমধ্যে চলচ্চিত্র, শিল্পে পাইরেসি এতটাই হানা বসিয়েছে যে, দেশের অর্ধেক প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে গেছে। সংগীত জগতে নতুন ক্যাসেট রিলিজ বন্ধ প্রায়।

মিডিয়ায় প্রকাশিত সরকারি গেজেটের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সুপারিশ :

আমার বিবেচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কপিরাইট আইন সংশোধন করা যেতে পারে।

ক) কপিরাইটের একটি সহজবোধ্য সংজ্ঞার্থ প্রণয়ন করা।

খ) বেশ কিছু উপধারা যেমন নৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, রিলেটেড রাইটস, পাবলিক ডোমেইন, সংকলন ইত্যাদি বিষয় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী করা।

গ) ইউটিউবসহ নানা মাধ্যমে গান, নাটক, গ্রন্থ ইত্যাদিতে স্রষ্টার অধিকার পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখতে হবে।

ঘ) লোক গান ও লোক সংস্কৃতির অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হবে।

ঙ) কপিরাইট সমিতি গঠন করে তাকে কার্যকর করে গড়ে তুলতে হবে।

চ) কোনো ধরনের অননুমোদিত সম্প্রচার বন্ধ করার জন্য কপিরাইট অফিসকে ক্ষমতা প্রদান।

ছ) বিভিন্ন ধারায় শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করা।

প্রত্যেকটি মানুষের একটা সৃজনশীল মন থাকে। সে মনের পৃথিবীতে খেলা করে বিভিন্ন ভাবনা। সেই ভাবনাগুলো যখন সৃজনকর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তা শিল্পস্রষ্টাকে ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে শিল্পরসিকদের সম্পদ। সেই সম্পদের সুরক্ষা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথের সৃজনকর্ম অর্থাৎ আমাদের আলোচ্যমান রবীন্দ্র-সংগীতের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীরা উপার্জন করবে বিষয়টা এমন নয়। কপিরাইট আইন অনুযায়ী স্রষ্টার মৃত্যুর ৬০ বছর পেরিয়ে গেলে আর্থিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলেও নৈতিক অধিকার থাকবে যুগ-যুগান্তরে। পাকিস্তানিরা ভাষা গবেষক ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই'কে রবীন্দ্র-সংগীত লিখতে বললে তিনি বলেছিলেন : "আমি লিখলে এটা হাই সঙ্গীত

হবে, রবীন্দ্র সঙ্গীত হবে না" (শুভাগত, ২১ : ১)। অর্থাৎ আর একটি রবীন্দ্র-সংগীত সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। বিষয়টি গভীর এবং প্রাজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। দেশের উন্নয়ন শুধু আর্থিক উন্নয়ন নয়, মানবিক সূচকেরও উন্নয়ন দরকার। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজিতেও বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আর তাই স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মকে রক্ষাকল্পে যথাযথ আইন ও জনসচেতনতার প্রয়োজন। করুণাময় গোস্বামী রচিত *রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিক্রমা* গ্রন্থের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত, গায়কী স্বাধীনতার প্রশ্ন' অধ্যায়ে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য :

> রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা, নিরীক্ষা, অনুসন্ধান, প্রেরণা, অনুসরণ ইত্যাদি করার পর যখন গান রচনা করে ফেলতেন তখন এবং তারপর যখন তাকে গীতরূপ দান করতেন, সেখানে সেই রচনাকে একটা অঞ্চলে, স্থায়ী, অনড়, অমোঘ, রূপদানে সাজাতে পছন্দ করতেন। তাঁর নিজের সৃষ্টির কোন রকম বিকল্পের সম্ভাবনা থাকতে পারত না, না তাঁর নিজের কাছে না অন্য কোন সুরকার বা গায়কের কাছে। (করুণাময়, ১৩৯৯ : ১৮৮)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুর বেশি সময় মনে রাখতে পারতেন না। তাই তখনই শিখিয়ে দিতেন দীনেন্দ্রনাথকে। তিনি এস্রাজে সেই সুর তুলে স্বরলিপি করে নিতেন। গানটিও চিরদিনের মতো ধরা পড়ে যেত। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বলেছেন, "স্বরলিপি বিষয়ে দীনেন্দ্রনাথ হলেন সুপ্রিম কোর্ট" (আনন্দবাজার, ১১ জানুয়ারি ২০২০ : ৮)। রবীন্দ্র-সংগীতের প্রধান স্বরলিপিকার দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ কোনো গানের সুর ভুলে গেলে যার শরণাপন্ন হতেন, *ফাল্গুনী* নাটকে উৎসর্গ করতেন যাকে- 'সেই বালকদলের সকল নাটের কণ্ডারী, আমার সকল গানের ভান্ডারী' আখ্যায় অভিহিত করেছেন। তিনি 'সঙ্গীত সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ' নামক নিবন্ধে লিখেছেন, "অবিকৃত, বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত যদি কারো রসের খোরাক না জোগায় তবে সে দায় রবীন্দ্রনাথের নয় বরং শ্রোতার" (শিশিরকুমার, ২০১৯ : ৯৭)। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি স্মরণ করছি, যা এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যকে যথার্থতা প্রদান করে, চাঁপা ফুল পছন্দ নয় বলে তাকে নিয়ে স্থলপদ্ম গড়বার চেষ্টা না করে সে স্থলে উচিৎ চাঁপার বাগান ত্যাগ করে স্থলপদ্মের বাগানে আসন পাতা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যেটা আগে কোনো ভারতীয় গানে ছিল না। যা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। প্রচলিত নিয়মে তার জাত নির্ণয় করা চলে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ জাতের কথা ভাবেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দিকে, এক একটি বিশেষ ভাবকে, বিশেষ কথা, বিশেষ সুর-ছন্দে প্রকাশ করার দিকে। কোনো প্রচলিত রীতি যখন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, তখনও তার কথায় বা সুরে বা ছন্দে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য এনেছেন। ফলে সেগুলিকে অনুকরণ না বলে নবীকরণ বলা চলতে পারে। বাংলা তথা ভারতীয় গানের এই নবীকৃত রূপই হল রবীন্দ্রসংগীত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল রবীন্দ্রসংগীতে এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বর্তমান বিকৃতির স্বরূপ উন্মোচন ও তার শুদ্ধতা বা মৌলিকতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণকল্পে কতিপয় সুপারিশ প্রস্তাব।

সহায়কপঞ্জি

করুণাময় গোস্বামী (১৩৯৯)। *রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৩৭০)। *রবীন্দ্রসঙ্গীত*। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (১৪০৩)। *রবীন্দ্রসংখ্যা*। কলিকাতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৭৩)। *সঙ্গীতচিন্তা*। বিশ্বভারতী, কলিকাতা ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১)। *নৈবেদ্য।* বিশ্বভারতী, কলিকাতা ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৪)। *সাহিত্য*। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।
রবীচর্চা, বিশ্বভারতী, ১৩৭৬।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০১)। *নাটক সমগ্র*। অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৩৮)। *গীতবিতান*। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।
কাজল সেনগুপ্ত ও মোহিনী সাহানা (১৩৮৯)। *রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্বেষা*।
সম্ভুনাথ ঘোষ (১৯৭১)। *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিবৃত্ত*। সঙ্গীত প্রকাশন, কলিকাতা ।
দীলিপ রায় ও মোহিনী সাহানা (১৩৭৬)। *একান্ত রবীন্দ্রনাথ*।
শিশির কুমার দাস সংকলিত ও সম্পাদিত (২০১৯)। *সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী*। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

পত্রিকা

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ১০মে ২০১৬।
বাংলা নিউজ ২৪. কম অনলাইন পত্রিকা, ২৮ জানুয়ারি ২০১৩।
আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ ডিসেম্বর ২০১৯।
বাংলা নিউজ ২৪.কম, ২৮ জানুয়ারি ২০১৩।
'আলো চাই' সাময়িকী ২৯ জানুয়ারি ২০১৩।
'এই সময়' ১৭ মার্চ ২০২০।
ভোরের কাগজ পত্রিকা, ৪ আগস্ট ২০১৯।
'এই সময়', ১২ মার্চ ২০২০।
মিডিয়ায় প্রকাশিত সরকারি গেজেট।
আন্দবাজার পত্রিকা, 'রবিকাকা সুর বসাচ্ছেন, আমি এস্রাজে', ১১ জানুয়ারি ২০২০।
ডাক্তার প্রতিদিন, শুভাগত চৌধুরী, ২১ এপ্রিল ২০২১।